ইউনিট ১১

সংগঠন (Organising)

ভূমিকা

সংগঠন হচ্ছে ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পর ব্যবস্থাপকের উপর যে দায়িত্বটি পড়ে সেটা হচ্ছে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা। আর এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী বা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত ও অবস্থাগত উপকরণের প্রয়োজন হয়। এই উপকরণগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয় যা একজনের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন কোন কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন তা সনাক্ত করে বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাজগুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা (যেমনঃ ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাব বিভাগ, জন সম্পদ ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন যোগ্য লোককে এই বিভিন্ন বিভাগের কাজকে বুঝিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পন করার প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা সংগঠন বলে। তাই বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের কর্মী পর্যন্ত প্রত্যেকের কাজ ও দায়িত্ব কি হবে, এদের ভেতরকার সম্পর্ক কতটুকু দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে, কার কি পদ বা পদমর্যাদা হবে তা সবকিছুই নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে।

এই ইউনিটে ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সংজ্ঞা, গুরুত্ব, সংগঠনের প্রকারভেদ, সংগঠন কাঠামো ও চার্ট এবং এর নীতিমালা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ১ সংজ্ঞা ও গুরত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা সংগঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সংজ্ঞা

Organising শব্দটি "Organism" থেকে এসেছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে কতগুলো পৃথক অংশকে এমনভাবে সমন্বিত করা যার কারণে প্রত্যেকটি অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে কোন কিছুর সৃষ্টি হয়।

সাধারণভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার একটি প্রণালীকে সংগঠন বলা যায়।

তাই বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী চিহ্নিতকরণ, কার্যাবলী শ্রেণীবদ্ধকরণ উপকরণসমূহ একত্রীকরণ, শ্রেণীবদ্ধ প্রত্যেক কাজের বা বিভাগের জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃব্য নির্ধারণ ও প্রত্যেক বিভাগীয় ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা সংগঠন বলে।

নিম্নে ব্যবস্থাপনা বিশারদদের কিছু উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হলঃ

১. কুঞ্জ এবং উইরিচ (Koontz and Weihrich) বলেন, "সংগঠন হচ্ছে (১) প্রয়োজনীয় কাজ চিন্তিতকরণ ও শ্রেণীবিভাগ করা, (২) কাজকে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাগে ভাগ করা, (৩) প্রত্যেকটি ভাগকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে তত্ত্বাবধান করার মত কর্তৃত্ব সহযোগে অর্পন করা ও (৪) সংগঠন কাঠামোর মধ্যে সমান্তরাল ও ঘাড়াখাড়ি ভাবে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা।"

২. টেরি ও ফ্রাংকলিন এর মতে (Terry and Franklin) "সংগঠন হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উত্তম আচরণগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, যাতে উক্ত ব্যক্তিবর্গ মিলে-মিশে সন্তুষ্টি সহকারে দক্ষতার সঙ্গে কতিপয় পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে পারে।"

উপরের আলোচনা থেকে বরা যায় যে, সংগঠন হল ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর মধ্যে এমন একটি কার্যপ্রক্রিয়া যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী ও উপকরণাদি সনাক্তকরণ, এসব উপকরণ ও কাজকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করণ, উক্ত বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের উপর দায়িত্ব ক্ষমতাও ও কর্তৃত্ব অর্পন এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

সংগঠনের গুরুত্ব

নিচে ব্যবস্থাপনা সংগঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হল ঃ

১. **উদ্দেশ্য অর্জনে সহযোগীতা ঃ** সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলী এদের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে প্রতি বিভাগের দায়িত্ব একজন কর্মকর্তা বা নির্বাহীর ওপর অর্পন করা হয়। শুধু বিভাগ নয়, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক স্তরে সৃষ্ট উপবিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য ও পৃথক করে দেয়া হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য অর্জন সহজতর হয়।

২. **বিশেষীকরণে সহায়তা (Aid to specialisation)** ঃ একটি প্রয়োগযোগ্য ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা সংগঠন বিশেষজ্ঞতা ও শ্রমবিভাগের নীতির ওপর গড়ে ওঠে। এর ফলে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা ও সফলতার সাথে প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। ফলে প্রত্যেক বিভাগ, উপবিভাগ এবং কর্মী তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সব সময়ই পালন করে থাকে। এ কারণে বিশেষজ্ঞতার গুণ প্রত্যেকেই অর্জন করতে পারে।

৩. **বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ (Removal of indiscipline)** ঃ সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি কাজ ও দায়িত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ফলে কেউ কাজ বা দাযিত্ব এড়িয়ে চলতে পারে না। তাছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ, কর্মী, কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। এতে কাজের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা থাকে না।

৪. **মানব-শক্তির যথাযথ ব্যবহার (Effective utilisation of Human Resources)** ঃ আদর্শ সংগঠন কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির কাম্য ও যথাযথ ব্যবহারের উপায় নির্দেশ করা থাকে। এর মাধ্যমে প্রতিটি কাজের ধরণ নির্ধারণ করে যে ব্যক্তি যে কাজের যোগ্য, তাকে সেই কাজের জন্য নিয়োগ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পন করে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে কর্মীবাহিনীর সামর্থ পুরোপুরি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

৫. **সৃজনশীলতার বিকাশ (Development of creativity)** ঃ সংগঠন কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে নতুন নতুন পন্থা পদ্ধতি, সূত্র, নিয়ম অথবা উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয় উন্নয়নে ও প্রয়োগে যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমনঃ কর্মীগণ একই কাজ সব সময় করার ফলে ঐ কাজ যাতে আরও সহজভাবে কিভাবে করা যায় তা কর্মীরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা উদ্ভাবন করতে পারে। আর সংগঠনিক কাঠামোর দ্বারা তা সম্ভব হয়।

৬. **সহজ সমন্বয় (Easy co-ordination)** ঃ সংগঠনের একটি কাজ হল বিভিন্ন বিভাগ, কাজও কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি। এজন্য সংগঠনে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মী তার কার্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকে। এছাড়াও প্রত্যেকে তার উর্ধ্বতন ও অর্ধস্তন সম্পর্কে এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বিভাগ ও তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারে। এতে বিভিন্ন কর্মী ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

৭. **কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বন্টন (Distribution of Authority and Responsibility)** ঃ সংগঠন সদস্যদের মধ্যে কর্তত্ব ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বন্টন করে কার্যের নির্দিষ্টতা নিশ্চিত করে ফলে সহেজই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

৮. **প্রশাসনিক কার্যে সহায়তা (Help in Administrative task)** ঃ সুসংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী কাঠামো প্রশাসনের ভিতশক্ত

করে। প্রশাসনিক দুর্বলতা ও বিচ্যুত অপসারিত হয় এবং কর্তৃত্ব সুষমভাবে বণ্টিত হয়। এর ফলে প্রশাসকগণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশাসনকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করতে পারে।

৯. **সহজ নিয়ন্ত্রণ (Easy control)** ঃ সংগঠন কাঠামোতে প্রতিটি বিভাগ ও কর্মীর কার্য, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও দায়িত্বের স্পষ্ট ব্যাখ্যা থকায় তাদের কার্যাবলী সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া কে, কাকে, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তারও দিক নির্দেশনা সংগঠন কাঠামো হতেই পাওয়া যায়।

১০. **সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনে সহায়তা (Facilities in expansion and alteration)** ঃ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সুদূর পরাহত হয়। প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন সংগঠন কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এজন্য দূর দর্শিতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সংগঠন কাঠামো তৈরী করা হলে ভবিষ্যত সম্ভাব্য সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এই সংগঠন কাঠামোত অত্যন্ত সহায়ক হয়।

১১. **ব্যবসায়ের উন্নয়ন (Development of business)** ঃ বর্তমান যুগে নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন এবং আধুনিক উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছে। এ সব নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন সাধন একমাত্র উত্তম সংগঠন কাঠামোর মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্যই শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠার ওপর বর্তমান কালে এত বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

Organising শব্দটি 'Organism" হতে এসেছে।

সাধারণভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সহযোগীতার ভিত্তিতে কাজ করার একটি প্রণালীকে সংগঠন বলা যায়।

একটি প্রয়োগযোগ্য ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা সংগঠন বিশেষজ্ঞতা ও শ্রমবিভাগের নীতির উপর গড়ে ওঠে।

সংগঠন সদস্যদের মধ্যে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বন্টন করে কার্যের নির্দিষ্টতা নিশ্চিত করে।

পাঠ ২ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সংগঠনের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংগঠনের প্রকারভেদ

সংগঠনকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(ক) আনুষ্ঠানিক সংগঠন (Formal organisation)

(খ) অনানুষ্ঠানিক সংগঠন (Informal organisation)

(গ) কমিটি (committee)

(ক) আনুষ্ঠানিক সংগঠন (Formal organisation) ঃ

প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মনীতির গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্তর থেকে শীর্ষস্তর পর্যন্ত কর্তৃত্বের বা আদেশের যে শিকল প্রস্তুত (chain of command) করা হয় তাকেই আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলা হয়। এখানে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, কে কার নিকট দায়ী থাকবে এবং জবাবদিহি করবে তার রুপরেখা, কে কার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে তার নিয়মকানুন, কর্মীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার স্তরবিন্যাস-এ সব কিছুই এ সংগঠনে উপস্থিত থাকে। এখানে একজন কর্মী ইচ্ছা করলেই তার উপরস্থ নির্বাহীকে বাদ দিয়ে আরো উপরের স্তরের নির্বাহীর সাথে আলাপ করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত সবাইকে নির্ধারিত দায়িত্ব সবাইকে অবশ্যই পালন করতে হয়। দায়িত্বের অবহেলার জন্য শাস্তির বিধান থাকে। নানারকম আনুষ্ঠানিক সংগঠন যেমন সরলরৈখিক, কার্যভিত্তিক, সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন ইত্যাদি একটি প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়।

(খ) অনানুষ্ঠানিক সংগঠন (Informal organisation) ঃ

কোনরূপ আনুষ্ঠানিক প্রথা ছাড়াই সংগঠনের কর্মী ও নির্বাহীদের ব্যক্তিগত মেলামেশলা, খেয়াল-খুশি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দ থেকে অনানুষ্ঠানিক ভাবে যে সম্পর্ক বা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রবণতা সৃষ্টি হয় তাকেই অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বলা হয়। এই অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক নির্বাহীদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে কিংবা শ্রমিক সংঘের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সচেতন বা অবচেতন ভাবে গড়ে ওঠে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের মধ্যে উপদল গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণতঃ আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে ওঠে। সংগঠনিক কাঠামোতে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের উল্লেখ না থাকলেও অনেক সময় উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যাপারে এবং অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারেও অনানুষ্ঠানিক সংগঠন খুবই সহায়ক হয়।

অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের প্রকারভেদ ঃ

প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমনঃ

(১) বন্ধুত্বসুলভ অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন;

(২) কর্ম গোত্রভুক্ত অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন; নিম্নে এদের ব্যাপারে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) বন্ধুত্ব সুলভ অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক কর্মীর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ফলে এসকল কর্মী একে অপরের সাথে সহযোগিতা ও যোগাযোগ করে এবং একে অপরের কার্যদ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই প্রতিষ্ঠানে যখন এরূপ দলের অস্তিত্ব থাকে তখন দেখা যায় একজন কর্মী তার বন্ধুকর্মীর কাজের সহযোগিতা করছে বা তার কাজে প্রভাব বিস্তার করছে।

(২) কর্ম-গোত্রভুক্ত অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন ঃ

অন্য এক প্রকার অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন দেখা যায় যেগুলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে গড়ে ওঠে। সাধারণতঃ যে সব কর্মী খুব ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে কার্য সম্পাদন করে, তাদের মধ্যে এরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে। আনুষ্ঠানিক সংগঠনকে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সরলরৈখিক সংগঠন (Line organisation)
২. সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন (Line and staff organisation)
৩. কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional organisation)
৪. কমিটি (Committee)

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার আনুষ্ঠানিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

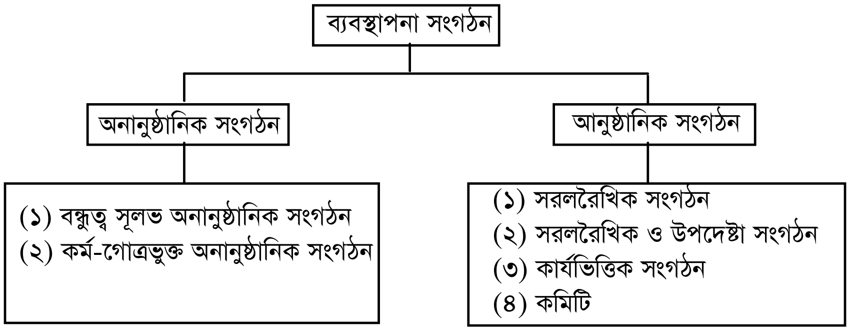
ব্যবস্থাপনা সংগঠন
অনানুষ্ঠানিক সংগঠন
আনুষ্ঠানিক সংগঠন
(১) বন্ধুত্ব সূলভ অনানুষ্ঠানিক সংগঠন
(২) কর্ম-গোত্রভুক্ত অনানুষ্ঠানিক সংগঠন
(১) সরলরৈখিক সংগঠন
(২) সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন
(৩) কার্যভিত্তিক সংগঠন
(৪) কমিটি

চিত্র ঃ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রকারভেদ।

(১) সরলরৈখিক সংগঠন (Line organisation) ঃ

শুধুমাত্র সরলরৈখিক কর্মকর্তা অথবা কর্তৃত্ব সহকারে যে সংগঠন কাঠামো গঠিত হয় অর্থাৎ যে সংগঠন কাঠামোতে সরলরৈখিক নির্বাহীর সাথে কোন সহযোগী বা উপদেষ্টা কর্মী থাকে না তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে। এই সংগঠন কাঠামো সবচাইতে সহজ ও পুরাতন সংগঠন কাঠামো।

প্রকৃত অর্থে, যে সংগঠন পদ্ধতিতে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব রেখা কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তর হতে সরল রেখার মত উপর থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে আসে তাকে সরল রৈখিক সংগঠন বলা হয়। সামরিক সংগঠনে উর্ধ্বতনের আদেশ অধীনস্থরা বিনা দ্বিধায় মানতে যেভাবে বাধ্য থাকে, সরলরৈখিক সংগঠনে আদেশদান এবং তা পালনে অনুরূপ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় বলে একে সামরিক সংগঠন ও বলা হয়।

এই ধরনের সংগঠনে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুন্দরভাবে বর্ণিত থাকে এবং আদেশ ও নির্দেশদানের জন্যও সুনির্দিষ্ট পথরেখা থাকে। এই নির্দিষ্ট পথরেখা অনুসারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ অধীনস্থ কর্মচারীদের দিকে প্রবাহিত হয়। রৈখিক কর্মকর্তাদের সাহায্যের জন্য কোন উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা থাকে না।

সরলরৈখিক সংগঠনের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি বিভাগের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপবিভাগ তৈরী করা হয়। এসব বিভাগ এবং উপ-বিভাগে একজন করে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকেন। এই কর্মকর্তাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন যাবতীয় কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তিনি তার অর্ধস্তনদের কাজের দিকে লক্ষ্য রাখেন।

শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কর্তৃত্ব অর্পন করেন আর এভাবেই সংগঠনের শীর্ষস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত দায়িত্ব ও কর্তত্বের লম্ব রেখার সৃষ্টি হয়। নিম্নের চিত্রে সরলরৈখিক সংগঠনের একটি কাল্পনিক নমুনা প্রদান করা হলো ঃ

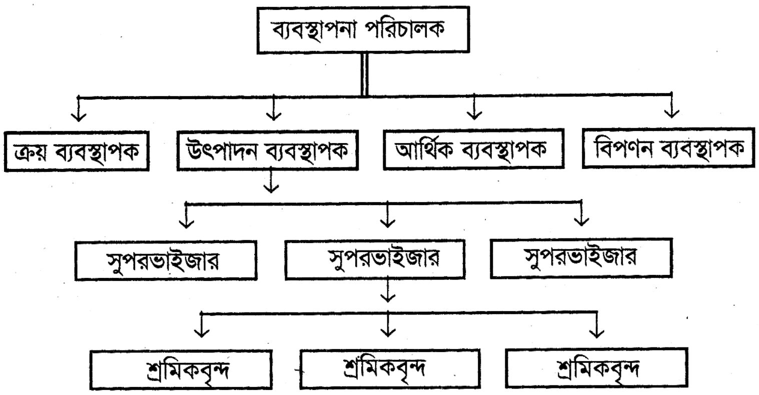

চিত্র ঃ সরলরৈখিক সংগঠন

প্রাচীনতম সংগঠন পদ্ধতি হিসেবে সরলরৈখিক সংগঠন এমন কিছু বৈশিষ্টের অধিকারী যার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আজ পর্যন্তও এটি একটি গ্রহণযোগ্য সংগঠন কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. এটি সবচাইতে সরল এবং সহজবোধ্য সংগঠন কাঠামো।

২. এ ধরনের সংগঠন কাঠামোতে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব শীর্ষ ব্যবস্থাপনা স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপনার দিকে সরলরেখার মত নেমে আসে। ফলে সংগঠনে একটি উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৩. এই সংগঠন কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলীকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এর প্রতিটি বিভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পৃথক ভাবে তাদের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে।

৪. এই প্রকার সংগঠন কাঠামোতে অধঃস্তন নির্বাহী শুধুমাত্র তার অব্যবহিত উর্ধ্বতনের আদেশ মানতে বাধ্য থাকে এবং অর্পিত কাজের জন্য শুধুমাত্র উপরের উর্ধ্বতনের নিকট জবাবদিহি করে।

৫. এই প্রকার সংগঠনে প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন বিভাগীয় দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয় এবং সব বিভাগ একজন সাধারণ ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

৬. এই প্রকার সংগঠনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল সংগঠনে এক বিভাগ অন্য বিভাগের সাথে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করে বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে।

৭. এ ধরনের সংগঠনে উর্ধ্বতন নির্বাহী তার নিচের অধীনস্থের উপর অধিক মাত্রায় কর্তৃত্ব আরোপ করে।

৮. এই সংগঠনের ক্ষেত্রে একজন নির্বাহীর দক্ষতা তার অধীনে ন্যস্ত বিভাগ বা সংগঠনকে অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করে।

৯. এই প্রকার সংগঠনে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য সঠিক ভাবে অর্জন করার জন্য একজন নির্বাহীকে অধিক মাত্রায় দয়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। এজন্য দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বার্পনে সমতা বিধান সরলরৈখিক এবং সংগঠনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

১০. অন্যান্য সংগঠনের চেয়ে এই ধরনের সংগঠনে অধিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরের বিশেষ বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণে ক্ষুদ্রায়তন ও জটিলতামুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সংগঠন কাঠামো অধিকতর উপযোগী হয়।

সরলরৈখিক সংগঠনের সুবিধা ঃ

সরলরৈখিক সংগঠনের যেসব সুবিধা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১. এই সংগঠনে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট গতিরেখা নির্ধারিত থাকে বলে প্রত্যেকটি কর্মীই তার উপর অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারে।

২. এ ধরনের সংগঠনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাদের অধীনস্ত কর্মীদেরকে কাজের মাধ্যমে বা সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। এতে কর্মীদের দক্ষতা ও মেধা বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩. সংগঠনের প্রত্যেকটি কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট ও সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত থাকায় কার্যক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয় এবং কর্তৃত্বের অপব্যবহার রোধ করা যায়।

৪. এই ধরনের সংগঠনে কোন বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না বলে উর্ধ্বতন কর্ম কর্মকর্তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

৫. সরলরৈখিক সংগঠনের আর একটি সুবিধা হল, প্রত্যেকটি কর্মীই পরবর্তী পদ ও কার্য বন্টন সম্পর্কে পূর্ব থেকেই জ্ঞাত বা ওয়াকিবহাল থাকে এবং পদোন্নতির জন্য সকলেই সচেষ্ট থাকে।

৬. এই জাতীয় সংগঠনে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট রূপরেখা, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ ইত্যাদি কর্মীদেরকে নিজ নিজ কাজ সটিকভাবে সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে প্রেষিত করে।

৭. সামরিক নিয়মতান্ত্রিকতা অনুসারে এই ধরনের সংগঠন পরিচালিত হয় বলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপরিভাগ ও শাখা ও প্রশাখার কার্যাবলীর মধ্যে সহজেই সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হয়।

৮. প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুষ্ঠু বন্টন এবং আদেশ ও নির্দেশের সুষ্ঠু গতিরেখা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের খুব সহজেই অধস্তনদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

৯. এই সংগঠনের আর একটি সুবিধা হল যে, এটা একটি স্থায়ী প্রকৃতি সংগঠন। আর এজন্য এর ভিত খুবই শক্তিশালী হয়।

১০. অধীনস্তদের উপর অর্পিত কাজের ফলাফল ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে সহজেই নির্ণয় করা যায়।

সরলরৈখিক সংগঠনের অসুবিধা

একটি সরলরৈখিক সংগঠনে যে সব অসুবিধা দেকা দেয় নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো

১. সরলরৈখিক সংগঠনে নির্বাহীরা কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়াই নিজেরা যাবতীয় কার্য সম্পাদন করেন বলে প্রতিটি কাজেই বিশেষায়নের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. এই সংগঠনে দক্ষ সর্বগুণে গুণান্বিত ও সার্বিক অর্থে দক্ষ কর্মীর অপ্রতুলতার কারণে সংগঠনের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড, প্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনকে ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করে।

৩. প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানদের হাতে নিজ নিজ বিভাগের সার্বিক ক্ষমতা থাকায় এ সংগঠন খুবই সহজেই স্বৈরাচারী সংগঠনে পরিণত হয়। বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাবে রৈখিক কর্মকর্তারা প্রায়ই যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত থাকেন। এতে কাজের অগ্রগতি ব্যহত হয়।

৪. এই প্রকার সংগঠনে কর্মীর স্বল্পতার কারণে এক এক জন কর্মীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অনেক বেশী হয়। ফলে কাজের ভেতর বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিতহয়।

৫. এই সংগঠনে অধস্তন কর্মীরা জানে যে তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের খেয়ালখুশির ওপরই তাদের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। এতে স্বভাবতঃই অধস্তনেরা তোষামোদের আশ্রয় গ্রহন করতে প্রবৃত্ত হয় এবং উর্ধ্বতনেরাও স্বজন-প্রীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৬. রৈখিক কর্মকর্তাগণ কদাচিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধস্তনদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

৭. এই সংগঠনে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বহু সংখ্যক নির্বাহী নিয়োগ করতে হয়। এছাড়াও আন্তঃ বিভাগীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কাজেও অনেক সময় লাগে। ফলে খরচ বৃদ্ধি পায়।

(২) সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন (Line and staff organisation)

বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় জগতে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন এবং সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে সরলরৈখিক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ বা পদস্থ কর্মীদের নিয়ে যে নতুন ধনের সংগঠন কাঠামো গড়ে উঠেছে তাকেই সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন বলে।

আরও সহজভাবে বলতে গেলে এটা এমন এক ধরনের সংগঠন যাতে সরলরৈখিক কর্মকর্তাকে যথোপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ দানের জন্য উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। এরূপ সংগঠনে উপদেষ্টাগণ শুধু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা আদেশ নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা তাদের থাকে না। এক্ষেত্রে সরলরৈখিক কর্মকর্তারাই সমস্ত ব্যবস্থাপকীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শ বা উপদেশ কার্যকরী করা বা না করা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সংগঠনের জটিল টেকনিক্যাল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রৈখিক কর্মকর্তাগণ উপদেষ্টাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করেন। রৈখিক কর্মকর্তাগণ নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বিধান করেন এবং উপদেষ্টাগণ কি করা উচিত সে ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন। এই ধরনের সংগঠনে রৈখিক কর্মকর্তাগণ পণ্য উৎপাদন সুনিশ্চিত করেন, অপর দিকে বিশেষজ্ঞ কর্মীগণ গবেষণা, পরিকল্পনা, গণসংযোগ, শিল্প সম্পর্ক, কারিগরি প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এখানে বিশেজ্ঞগণ রৈখিক

কর্মকর্তাদের উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন না। অবশ্য সংগঠনে বিশেষজ্ঞ কর্মীদের গুরুত্ব থাকায় রৈখিক কর্মকর্তাগণ তাদের উপদেশ ও পরামর্শ মেনে চলেন।

নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন কাঠামো প্রদর্শন করা হল।

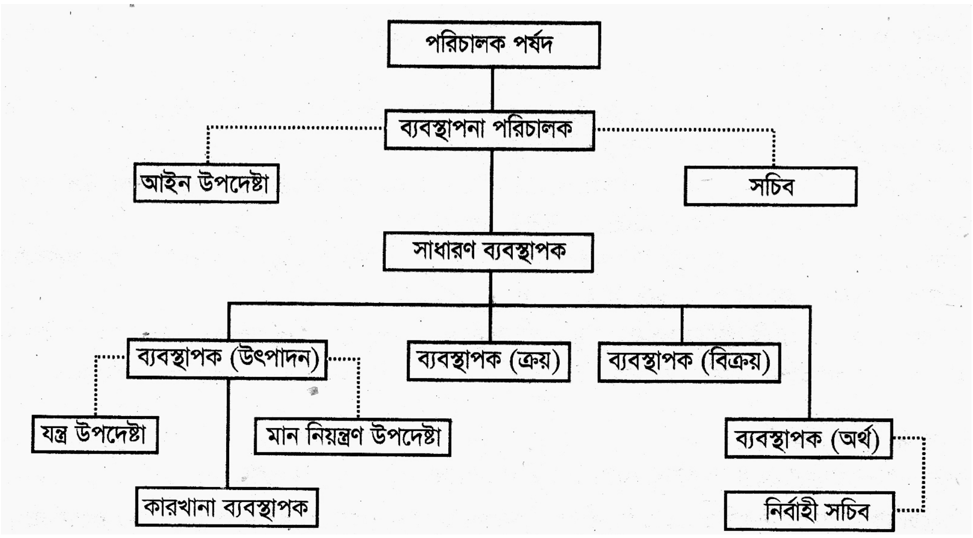
পরিচালক পর্ষদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আইন উপদেষ্টা
সচিব
সাধারণ ব্যবস্থাপক
ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
ব্যবস্থাপক (বিক্রয়)
যন্ত্র উপদেষ্টা
মান নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা
ব্যবস্থাপক (অর্থ)
কারখানা ব্যবস্থাপক
নির্বাহী সচিব

এখানে ______ সরলরৈখিক নির্বাহী

.... উপদেষ্টা

চিত্র ঃ সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন

বৈশিষ্ট্য ঃ

সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠনের নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়-

১. এই সংগঠনে দুধরনের কর্মী থাকে, একদল সরলরৈখিক কর্মী বা নির্বাহী এবং অন্যদল উপদেষ্টা কর্মী।

২. এই সংগঠনের কর্তৃত্ব রেখা ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তর হতে ক্রমশ নিম্নস্তরে নেমে আসে, তবে সরলরৈখিক নির্বাহীর পাশে উপদেষ্টা কর্মীগণ প্রয়োজনীয় অবস্থান ও পদ গ্রহণ করেন।

৩. এই সংগঠনে দুই ধরনের কর্মী থাকলেও সরলরৈখিক কর্মকর্তাগণই ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

৪. এখানে উপদেষ্টা কর্মীদের কাজ হল সরলরৈখিক কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান এবং কার্যক্ষেত্রে সহযোগীতা করা।

৫. উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মীদের দেওয়া উপদেশ ও পরামর্শ সংগঠনের রৈখিক নির্বাহীগণ মানতে বাধ্য থাকে না তবে উপদেষ্টাদের বিশেষ গুরুত্ব থাকায় তা মেনে চলা হয়।

৬. এই প্রকার সংগঠনে একজন অধীনস্থ নির্বাহী তার কাজের জন্য কেবলমাত্র তার অব্যবহিত উপরের নির্বাহীর নিকট দায়ী হয় এবং তারই নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকে।

৭. তুলনামূলকভাবে বৃহদায়তন ও জটিল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠন কাঠামো ব্যবহৃত হয়।

সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠনের সুবিধাসমূহ

নিম্নে সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠনের সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলঃ

১. এই সংগঠনে কর্মীরা নৈপুণ্যের সাথে সব বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, সুতরাং এটা বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কর্মীরা অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে ওঠে।

২. বিশেষজ্ঞ কর্মী বিদ্যমান থাকায় সরলরৈখিক কর্মীদের কার্যভার লাঘব হয়।

৩. এর ফলে সরলরৈখিক সংগঠনের সাথে বিশেষজ্ঞতা ও শ্রম বিভাজনজনিত সুবিধাদি লাভ করা যায়।

৪. সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তির অভাবে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে সরলরৈখিক সংগঠনে যে সময়ের অহেতুক অপব্যবহার হতো, প্রযুক্তির জ্ঞানের ব্যবহারে এই ধরনের সংগঠনে সেই সময় বেঁচে যায়।

৫. বিশেষজ্ঞ কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ সম্পাদনের ফলে লাইন কর্মকর্তারাও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ও

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে।

৬. উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে গৃহিত সিদ্ধান্ত সঠিক ও যথার্থতার দাবি রাখে।

সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠনের অসুবিধা

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলঃ

১. সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা কর্মীদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হতে পারে। ফলে কাংখিত কাজের পরিবেশ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।
২. বারবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া মূলতঃ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করে।
৩. এই প্রকার সংগঠন ব্যবস্থাপনায় সরলরৈখিক কর্মী ও বিশেষজ্ঞ কর্মীদের পারিশ্রমিক ছাড়াও কারিগারি ও প্রযুক্তিগত ব্যয় সংশ্লিষ্ট থাকে, ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশী হয় এবং এর সাথে বিক্রয়মূল্যও বেশী পড়ে।
৪. সরলরৈখিক কর্মকর্তা উপদেষ্টা কর্মীদের উপর এত বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে, এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক সময়ই কল্যাণকর হয় না।
৫. বিশেষজ্ঞ কর্মী তথা উপদেষ্টারা শুধুমাত্র একটি বিষয়েই মনোনিবেশ করে পারদর্শিতা অর্জন করে। ফলে অন্যান্য দিকে তার দুর্বলতা থেকেই যায়।

(৩) কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional Organisation) ঃ

কোন প্রতিষ্ঠানের মোট কার্যকে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে এক এক বিভাগে এক একজন করে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে শীর্ষ পদে নিযুক্ত করা হলে এবং উক্ত বিভাগ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পন করা হলে তাকে কার্যভিত্তিক সংগঠন বলে। এই ধরনের সংগঠনে বিশেষজ্ঞদেরকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ না করে সরাসরি নির্বাহী হিসেবে বিশেষ দায়িত্বে আসীন করা হয়।

বস্তুতঃ পক্ষে বিশেষজ্ঞদেরকে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সরলরৈখিক কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমেই কার্যভিত্তিক সংগঠনের জন্ম হয়, কার্যভিত্তিক সংগঠনে বিশেষায়ন ও শ্রমবিভাগের নীতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটে। এক্ষেত্রে বিশষজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন। এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তর থেকে পূর্ব নির্ধারিত কর্মের কর্মনায়কদের উপর নেমে আসে। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ তাদের উপর অর্পিত এক একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য মুখ্য কার্যনির্বাহীর কাছে দায়ী থাকেন। এ ধরনের সংগঠনে শ্রমিকদের একাধীক নির্বাহীর অধীনে কাজ করতে হয়। মূলত সরলরৈখিক সংগঠনের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যস্থাপনার জনক এফ. ডব্লুই, টেলর কার্যভিত্তিক সংগঠনের প্রচলন করেন।

নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে কার্যভিত্তিক সংগঠনের একটি কাল্পনিক চিত্র প্রদর্শন করা হলো ঃ

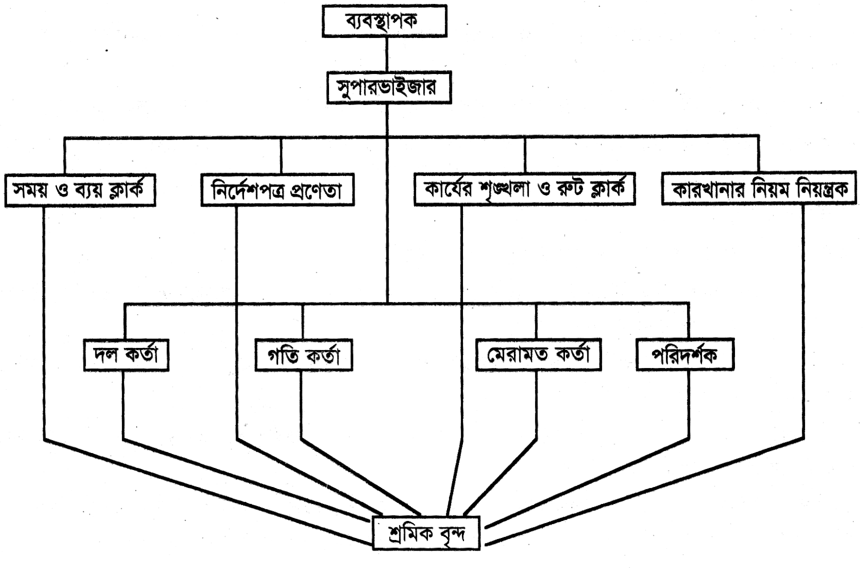

চিত্র ঃ এফ. ডব্লিউ. টেলরের কার্যভিত্তিক সংগঠন

বৈশিষ্ট্য

কার্যভিত্তিক সংগঠনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো আছে ঃ

১. এই প্রকার সংগঠনে কাজের ধরণ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সব কাজকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায় (যেমন, উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি)

২. এই সংগঠনে প্রত্যেকটা বিভাগের দায়িত্বে এক এক জন বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত থাকেন, এই বিশেষজ্ঞ তার উচ্চ স্তরে কর্মরত লাইন কর্মকর্তার নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার কর্তৃত্ব ভোগ করেন।

৩. এই সংগঠনে কর্তৃত্ব ও কর্তব্য বন্টন বিশেষায়নের ভিত্তিতে করা হয়।

৪. এই ধরনের সংগঠনে একজন শ্রমিক বা কর্মীকে একাধীক কর্মকর্তার অধীনে কাজ করতে হয়।

৫. এই সংগঠনের কর্তৃত্ব উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত ফোরম্যানগণ নিজেদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

৬. এই ধরনের সংগঠনে কর্মক্ষেত্র সীমিত হলেও কর্তৃত্বের পরিধি অসীম।

৭. এ ধরনের সংগঠনে একজন কর্মী কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জন করেন।

৮. আধুনিক বৃহৎ ও জটিল প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠনের বেশী প্রয়োগ দেখা যায়।

কার্যভিত্তিক সংগঠনের সুবিধা

কার্যভিত্তিক সংগঠনের সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

১. এই সংগঠনে বিশেষজ্ঞগণ স্বাধীনভাবে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

২. এ ধরনের সংগঠন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতি সহজে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

৩. এ সংগঠনে কর্মীগণ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে কার্যাবলী সম্পাদন করে বলে কর্মীদের কাজের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪. এর মাধ্যমে শ্রমের যথাযথ বিভাজন সহজতর হয় ও ব্যপক মাত্রায় উৎপাদন পরিচালনা করা যায়।

৫. বিভিন্ন কার্যসম্পাদন ও তদারকের জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তাকে একটি বিশেষ বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী হতে হয়।

৬. এই ধরনের সংগঠনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কার্যভার লাঘব হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের স্টাফ ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস পায়।

৭. বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের বিভাগগুলো সংগঠিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর হয়।

৮. এই সংগঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী কার্যের শ্রেণীবিভাগ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা কার্য সম্পাদন করা হয় বলে সর্বক্ষেত্রেই সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

কার্যভিত্তিক সংগঠনের অনুবিধা

একটি কার্যভিত্তিক সংগঠনের নিম্নরূপ বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা দেখা যায়-

১. নিম্ন স্তরে কর্মীগণ একই সময়ে বিভিন্ন উপদেষ্টার নিকট থেকে আদেশ-নির্দেশ লাভ করে বলে তারা কারও নির্দেশ শিথিল হয়, শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এবং সমন্বয়সাধন কষ্টকর হয়।

২. এই সংগঠনে একই সাথে একাধিক উপদেষ্টার নিকট হতে নির্দেশ লাভ করে থাকে যার ফলে এরূপ কর্মচারীদের কার্যভার মাত্রাতিরিক্তভারে বৃদ্ধি পায়।

৩. এরূপ সংগঠনে কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী কার্যাবলী অসংখ্য বিভাগ, উপবিভাগ প্রভৃতি স্তরে ভাগ করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রক্রিয়ায় জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

৪. একাধিক বিভাগের আদেশ নির্দেশ পালন করার কারণে কোন কর্মী বা বিভাগ ইচ্ছা করলে অন্যের দোহাই দিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে পারে। আর দ্বৈত অধীনতার কারণে এক্ষেত্রে অধস্তনদের সঠিকবাবে জবাবদিহিও করা যায় না।

৫. বিশেষজ্ঞগণ নির্বাহী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে সরলরৈখিক কর্মকর্তাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের

নিয়মাকানুন অমান্য করে অনেকক্ষেত্রে তারা নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

৬. প্রতিষ্ঠানকে যাবতীয় কার্যাবলী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত থাকে বলে ফলাফল পরিমাপ ও মূল্যায়ন এবং কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(গ) কমিটি (Committee) ঃ

কমিটি বা পর্ষদ হচ্ছে একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন যার ওপর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশাসনিক দায়িত্ব বা কোন কার্যভার অর্পিত হয়। বর্তমান জগতে সব ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মকান্ডে এটা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুতঃ কমিটিকে গণতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হিসেবে চিহ্নিত করাহয়। কমিটিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে তাকে। টিম (Team), পর্ষদ (Board), টাস্ক ফোর্স (Task force), কমিশন (Commission) পরিষদ (Board) ইত্যাদি হচ্ছে কমিটির বিভিন্ন রূপঃ

প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে কমিটির কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

প্রফেসর ডব্লিউ, এইচ নিউম্যান (W. H. Newman) এর মতে, “কমিটি হল একদল লোকের সমষ্টি যাদের ওপর নির্দিষ্টভাবে প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করা হয়।”

অইরিচ ও কুঞ্জ (Weihrich and Koontz) বলেন, ‘কমিটি হল কতিপয় ব্যক্তি সমষ্টি যাদেরকে দলবদ্ধভাবে তথ্য সরবরাহ পরামর্শ প্রদান, ধারণার বিনিময় অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব অর্পন করা হয়।”

সাধারণত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কতিপয় বিশিষ্ট কর্মকর্তাকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। এটা সমিষ্টিগতভাবে কাজ করে এবং কার্য সম্পাদনের জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করেন। শুধুমাত্র কমিটির দায়িত্ব পালন কোন সদস্যের মুখ্য কাজ নয়। প্রত্যেক সদস্যেরই নিজ নিজ দায়িত্ব থাকে যা তাদের প্রধান কাজ বলে গণ্য হয়। আর এই মূল দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে সস্যরা কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের সুবিধার্থে সদস্যদের একজনকে সভাপতি বা আহ্বায়ক মনোনিত করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

উপরের আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে, কমিটি হলো বিশেষভাবে নির্বাচিত বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনিত এমন কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যাদের ওপর বিশেষ কোন প্রশাসনিক কাজ বা দায়িত্বভার অর্পন করা হয় এবং যারা সু-সংগঠিত ভাবে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, একটি কমিটি অবশ্যই একাধীক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সমস্যা তদন্তের জন্য “এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি” গঠন করা হয়ে থাকে। এটা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকার কমিটির আওতায় পড়ে না।

বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞাসমূহ এবং কমিটির স্বাভাবিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে যেসব বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণভাবে আমাদের নিকট লক্ষ্যণীয় তা নিম্নরূপঃ

১. কমিটি হলো সাধারণত কতিপয় (একাধিক) ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার সংগঠন।

২. একটি কমিটির সদস্যগণ সাংগঠনিক নিয়মে নির্বাচিত বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

৩. সাধারণত একটি কমিটিতে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হন।

৪. কমিটির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কমিটির বাইরেও নির্ধারিত কাজ থাকে।

৫. একটি কমিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী যেকোন ধরনের হতে পারে।

৬. কমিটির সদস্যরা এতে সমমর্যাদা ভোগ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতির অনুসরণ করা হয়।

কমিটির সুবিধা বা কমিটি ব্যবহারের কারণ

সাধারণত নিম্নোক্ত সুবিধার কারণেই একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১. ইংরেজীর একটি প্রচলিত কথা হচ্ছে "Two heads are better than one." বাস্তবে একটি কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা ও স্বাধীন মত বিনিময়ের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। যার ফলে প্রতিষ্ঠান উপকৃত হতে পারে।

২. একটি কমিটিতে সবসময় গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়। কমিটিতে সব সদস্যই সমান মূল্যায়ন লাভ করে এবং সবার গুরুত্ব সমান। এক্ষেত্রে সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা উর্ধ্বতন নির্বাহীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

৩. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনে কমিটি বিশেষ সহায়তা করে। বিভিন্ন বিভাগ হতে আগত ব্যক্তিদের সমন্বয় গঠিত কমিটিতে প্রত্যেক বিভাগের সমস্যা উপস্থিত হয় এবং তাদের সমবেত প্রচেষ্টা। আন্তরিক সহযোগিতা ও চমৎকার সমঝোতার কারণে তাদের বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা ও যাবতীয় কার্যাবলী সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়।

৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটির সব সদস্যের কমবেশী অবদান থাকে। ফলে সব সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভ করা যায়।

৫. বিশেষ ক্ষেত্রে কমিটিতে বহিরাগত বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা তাদের বিশেষজ্ঞ জনিত মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এর ফলে জটিল সমস্যা সমাধান ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

৬. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে তথ্যাদি পরিবেশনের জন্য কমিটি অত্যন্ত উপযোগী। কমিটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাবলী ব্যাখ্যা সহকারে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট পরিবেশন করে যা সময় ও অর্থ দুইটিই সাশ্রয় করে।

৭. কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা যেহেতু অনেকের উপর অর্পিত হয় সেহেতু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কার্যভার লাঘব হয়। এভাবে বিক্রেন্দ্রীকরণের সুবিধা অর্জন করা যায়।

৮. কমিটি গঠনের ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের স্বার্থ সমুন্নত থাকে। এতেকরে ঐ প্রতিষ্ঠানে একটি ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করে।

৯. অধীনস্থদের নিয়ে গঠিত কমিটিতে তাদের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা বা নির্দেশনা বাস্তবায়নের কাজকে অধঃস্তনরা তাদের নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে যা তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে।

১০. কমিটির সদস্যদের যথাযোগ্য পদমর্যাদা ও সম্মান দান করা হয়ে থাকে। এতে প্রত্যেক সদস্যদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর কর্মীদের মনোবলও বেড়ে যায়।

কমিটির অসুবিধা

একটি কমিটির নিম্নরূপ অসুবিধা দেখা দেয়ঃ

১. কমিটির সদস্যগণ সাধারণত নিজ নিজ রুটিন ওয়ার্ক সম্পাদনের পর কমিটির কাজে এগিয়ে আসেন। ফলে জরুরী প্রয়োজনে তাদের একত্রিত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন বিলম্বিত হয়। এছাড়াও সকলের মতামত শোনার পর সিদ্ধান্তে পৌছতে হয় যা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

২. অনেক সময় কমিটির প্রত্যেক সদস্য প্রতিটি বিষয়ে তার মতামত প্রদানের বিষয়কে অধিকার বলে মনে করে। এতে উর্ধ্বতন নির্বাহীদের সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। ফলে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার চিড় ধরতে পারে।

৩. প্রকৃতপক্ষে কমিটিতে কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাদের সাথে যুক্তি-তর্কে অথবা উপমায় সংখ্যাগুরু সাধারণ সদস্যগণ বিভ্রান্ত ও হতাশা হয়ে পড়ে। ফলে কতিপয় প্রভাবশালী সদস্যরাই কমিটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

৪. কমিটির কার্যাবলী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি করে থাকে। আপ্যায়ন, সম্মানী, অন্যান্য ভাতাদি ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়, কমিটির সিদ্ধান্তের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে তা বেশি হয়ে থাকে। এছাড়াও মিটিং এ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণ শ্রমঘন্টা ব্যয় হয়।

৫. অনেক সময় দেখা যায় যে কমিটি গঠনের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পরও কিছু কিছু কমিটি থেকে যায়। এক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা এই কমিটিকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়।

৬. একটি কমিটি রাজনৈতিক দূষিত আবহাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজের দল, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকেই বড় করে দেখেন। এর ফলে কমিটিতে গৃহিত সিদ্ধান্ত সর্বসাধারণের অনুকূলে না হয়ে কূটনৈতিক চাল থেকে উদ্ভূত হয়।

৭. অনেক সময়ই কমিটিতে সৃজনশীল চিন্তাধারা বাধাগ্রস্থ হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত কোনপ্রকার বিচার বিবেচনা ছাড়াই ভোটাভুটির মাধ্যমে বিশেষ গণতান্ত্রিক রীতির কারণে পাশ হয়। কখন কখনও প্রভাবশালী সদস্যের

কথার বাইরে অন্যরা মুখ খুলতে চায় না আবার দায়িত্বে অবহেলার কারণেও অনেকে ভাল পরামর্শ দেয় না।

৮. কমিটির আর একটি বড় অসুবিধা হল এটা প্রায়ই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আলোচিত বিষয়ের উপর সকল সদস্যই মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আলোচনা অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী হয়। এতে অনেক অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

৯. কমিটির আলোচনায় মতামতের ভিন্নতা, সংখ্যালঘু সদস্যদের বাড়াবাড়ি ছাড়াও সকল সদস্যের সিদ্ধান্তের পক্ষে মত লাভের প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই আপোষমূলক সিদ্ধান্তের জন্ম দেয়। আর এরূপ আপোষমুলক সিদ্ধান্ত বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাল ফল দেয় না।

১০. একটি কমিটির সদ্যদের মধ্যে অনেক সময় উপদল গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতার ফলে মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তির উপরেও উপদলীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিস্তার করে। এতে সুষ্ঠু সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যহত হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

সংগঠনকে প্রধানত তিনবাবে ভাগ করা যায়- আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও কমিটি।

যে সংগঠন chain of command অনুসরণ করে তাকে আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলে।

আনুষ্ঠানিক সংগঠনের ক্ষেত্রে-কর্মীদের দায়িত্বের অবহেলার জন্য শাস্তির বিধান থাকে।

কোনরূপ আনুষ্ঠানিক প্রথা ছাড়াই সংগঠনের কর্মী ও নির্বাহীদের ব্যক্তিগত মেলামেশা, খেয়াল-খুশী, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দ থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাকে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বলে।

আনুষ্ঠানিক সংগঠন- সরলরৈখিক, কার্যভিত্তিক এবং সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা, এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

কমিটি হলো একদল লোকের সমষ্টি যাদের ওপর নির্দিষ্টভাবে প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (|) চিহ্ন দিন।

১. সংগঠনকে প্রধান কত প্রকারে বিভক্ত করা যায়?

ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

২. Chain of Command অনুসরণ করে কোনটি?

ক. আনুষ্ঠানিক সংগঠন খ. অনানুষ্ঠানিক সংগঠন
গ. কমিটি ঘ. বন্ধুসুলভ সংগঠন

৩. কোনটি আনুষ্ঠানিক সংগঠনের প্রকারভেদ নয়?

ক. বন্ধুসলভ খ. সরলরৈখিক
গ. উপদেষ্টা ঘ. কার্যভিত্তিক

৪. কর্ম-গ্রোত্রভুক্ত সংগঠন কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত?

ক. সরলরৈখিক খ. আনুষ্ঠানিক
গ. অনানুষ্ঠানিক ঘ. কমিটি

৫. নিম্নের কোনটি কোনগুলো কমিটির রূপ?

ক. টাস্ক ফোর্স খ. কমিশন
গ. পর্ষদ / বোর্ড ঘ. সবগুলো।

পাঠ ৩ সংগঠন কাঠামো, সংগঠন চার্ট ও সংগঠন নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সংগঠন কাঠামো ও সংগঠন চার্ট সম্পর্কে বর্ণনা পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার সংগঠনের নীতিমালা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংগঠন কাঠামো (Organisation Structure) ঃ

একটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মীই বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সম্ভাব্য বাধা বা অন্তরায় দূর করার জন্য কর্মীদের বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে যোগসূত্র বা সমন্বয় সাধন করা অর্থাৎ কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক।

তাই বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে যে পন্থা বা হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে সাংগঠনিক বা সংগঠন কাঠামো বলে। প্রতিষ্ঠানে যেসব কর্মী থাকেন তাদের মাঝে কে কার নিকট জবাবদিহি করবে, কে কাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে- এ সব কিছুই সংগঠন কাঠামোতে বর্ণিত থাকে।

সংগঠন কাঠামো কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে এবং এই নির্ধারিত সীমার মধ্যেই ব্যবস্থাপনাকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, সব বিভাগ, উপ-বিভাগ ও কর্মীদের দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও বাধ্যবাধকতা এ সবই- সংগঠন কাঠামো আওতাভুক্ত।

সংগঠন চার্ট (Organisation Chart) ঃ

কোন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোকে যখন একটি নক্‌শা চার্ট বা চিত্রে উপস্থাপন করা হয, তখন ঐ চিত্র বা চার্টকে সংগঠন তালিকা বা সংগঠন চার্ট বলা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোতে উল্লিখিত বিভিন্ন পদের উপর নিচে সম্পর্ক এই সংগঠন চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সংগঠন চার্ট থেকে সংগঠনের বিভিন্ন পদের বিভাগ ও উপবিভাগ সমূহ, সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব রেখাগুলো এবং সংগঠনের সামগ্রিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কোন বিভাগ কোন পর্যায়ে রয়েছে, প্রতিষ্ঠানের কোন স্তরে কতজন নির্বাহী ও কর্মী কর্মরত রয়েছে, নির্বাহীগণ কোন্ কোন্ স্তরে রয়েছে কে কার নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং কার কাছে জবাবদিহি করবে এসব বিষয়ই সংগঠন চার্ট থেকে জানা যায়।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, সংগঠন তালিকা হলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের কর্মীদের পারস্পরিক আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের একটি অংকিত রূপ বা চিত্র। প্রতিষ্ঠানের ভেতরের বা বাইরের যে কেউ প্রতিষ্ঠানের আকার এই তালিকার মাধ্যমে এক নজরে দেখে ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারে।

সাংগঠনিক কাঠামো ও সংগঠন চার্ট এর মধ্যে মূল পার্থক্য হল কাঠামো চাক্ষুষ দেখা যায় না আর এটি হচ্ছে একটি হাতিয়ার অপরদিকে সংগঠন চার্ট এর মাধ্যমে আমরা সাংগঠনিক কাঠামোর আকার চাক্ষুষ দেখতে পাই।

সংগঠন তালিকার প্রকারভেদ ঃ

সংগঠন কাঠামোর আয়তনের উপর নির্ভর করে সংগঠন তালিকাকে নিম্ন লিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সমান্তরাল সংগঠন তালিকা (Horizontal Chart) ঃ

প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোতে বিভিন্ন কর্মীদেরকে তাদের পদমর্যাদার ক্রমানুসারে সমান্তরালভাবে সাজিয়ে নক্‌শা অংকন করা হয় তখন ঐ নক্‌শা বা চার্টকে সমান্তরাল সংগঠন চার্ট বা তালিকা বলে।

নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে এই চার্ট প্রদর্শন করা হল ঃ

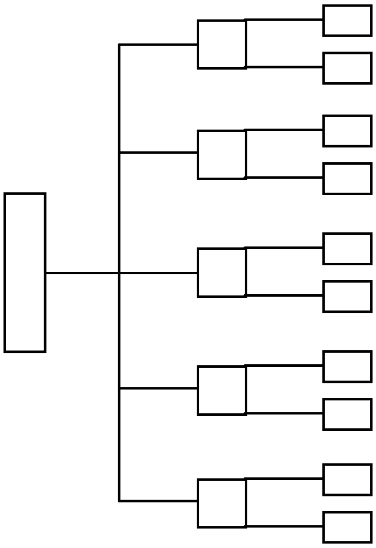

চিত্র ঃ সমান্তরাল সংগঠন তালিকা / চার্ট

(খ) পিরামিড আকৃতির সংগঠন তালিকাঃ

যে সংগঠন কাঠামোতে বিভিন্ন কর্মীর অবস্থান বা পদ সাজানোর পর পিরামিডের আকার ধারণ করে তখন তাকে পিরামিড আকৃতির চার্ট বলে। এই সংগঠন কাঠামোতে উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বেশী কর্মী হয় বলে এই চার্ট পিরামিড আকৃতি ধারণা করে। কুঞ্জ এবং অইরিচ এই চার্ট কে পিরামিডের সাথে তুলনা করেন।

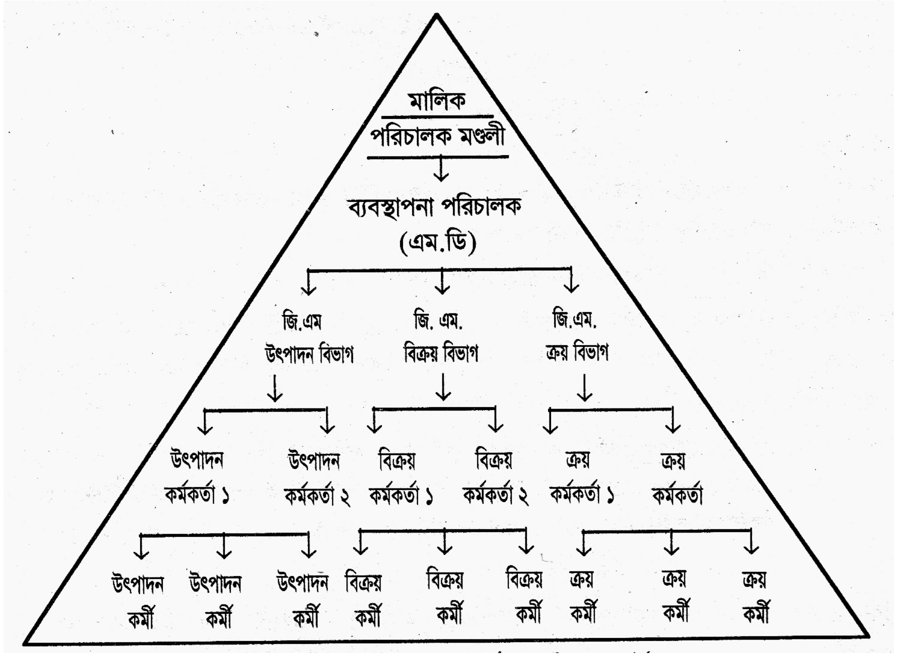
মালিক
পরিচালক মণ্ডলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(এম.ডি)
জি.এম
উৎপাদন বিভাগ
জি. এম.
বিক্রয় বিভাগ
জি.এম.
ক্রয় বিভাগ
উৎপাদন কর্মকর্তা ১
উৎপাদন কর্মকর্তা ২
বিক্রয় কর্মকর্তা ১
বিক্রয় কর্মকর্তা ২
ক্রয় কর্মকর্তা ১
ক্রয় কর্মকর্তা
উৎপাদন কর্মী
উৎপাদন কর্মী
উৎপাদন কর্মী
বিক্রয় কর্মী
বিক্রয় কর্মী
বিক্রয় কর্মী
ক্রয় কর্মী
ক্রয় কর্মী
ক্রয় কর্মী

চিত্র ঃ পিরামিড আকৃতির সংগঠন তালিকা / চার্ট

(গ) উলম্ব সংগঠন তালিকা (Vertical Chart) ঃ

এই তালিকাতে বিভিন্ন কর্মীকে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী পরস্পর উপর নীচ করে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ

সাজানোটা খাড়াখাড়ি করা হয়।

এই তালিকা নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

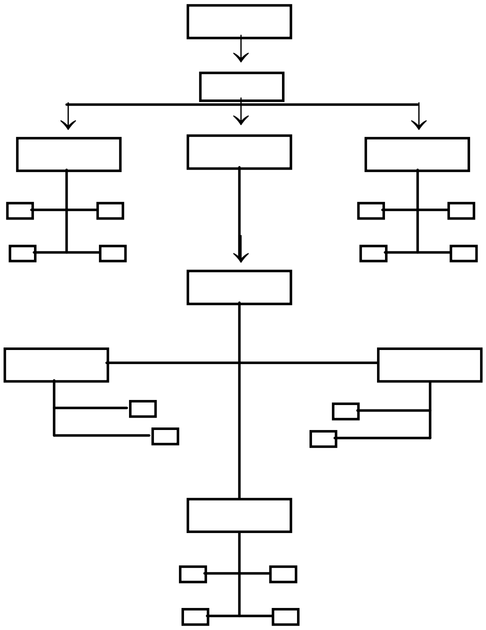

চিত্র ঃ উলম্ব সংগঠন তালিকা / চার্ট

(ঘ) বৃত্তাকার / গোলাকৃতি সংগঠন তালিকা (Circular Chart) ঃ

যে সংগঠন তালিকায় সম মর্যাদার বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীকে একই বৃত্তে নির্দিষ্ট দূরত্বে সাজানো হয় তাকে বৃত্তাকার সংগঠন তালিকা বলে। জাপানের ডায়েট এভাবে সাজানো হয়েছে।

নিম্নে বৃত্তাকৃতির সংগঠন চার্ট প্রদর্শিত হল ঃ

সংগঠনের নীতিমালা

একটি শক্তিশালী সংগঠন এবং এর গতিশীলতা কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর নির্ভরশীল। এই নীতিমালা সমূহ সংগঠনের সফলতা ও ফলপ্রদতার জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

বহু মনীষী বিভিন্ন সময়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সংগঠনের বহুনীতি উদ্‌ঘাটন করেছেন।

১৯৩৮ সালে বিভিন্ন লেখকদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে urwick ৮টি নীতির কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও, Taylor, Fayol, wickesbery প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা উল্লেখ করে। নিম্নে এগুলো বর্ণিত হল ঃ

১. উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of goal) ঃ

একটি কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন সংগঠককে সর্বপ্রথমেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে বিবেচনা করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যেমন হবে সংগঠনকেও সেভাবেই গড়ে তোলা উচিত। একটা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকে যে ভাবে তৈরী করা প্রয়োজন হয় একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকে সেভাবে গঠন করলে চলে না।

২. দক্ষতার নীতি (Principle of effieiency) ঃ

সাংগঠনিক বিন্যাস এমন হওয়া উচিত যাতে ন্যূনতম খরচে এবং কম সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

৩. সমতার নীতি (Prinicple of equity) ঃ

একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সমতা বিধান করা অপরিহার্য। কর্তৃত্ব বেশী অথচ দায়-দায়িত্ব কম থাকলে নির্বাহীগণ সাধারণত স্বৈরাচারী হয়ে পড়ে আবার দায়িত্ব বেশী কিন্তু

কর্তৃত্ব কম হলে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না।

৪. দায়িত্বের নীতি (Principle of responsibility) ঃ

একটি সংগঠনে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক নির্বাহী ও কর্মী যেন জানতে পারে যে তার দায়িত্ব কি ও কর্তৃত্বে সীমা কতদূর। সাধারণত একটি সংগঠনের উচ্চ স্তরের নির্বাহীর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বেশী হয় এবং নীচের দিকে ক্রমান্বয়ে তা কমতে থাকে।

৫. জোড়া মই শিকলের নীতি (Principle of scalar-chain) ঃ

এই নীতির ব্যাখ্যা হল ব্যবস্থাপনার শীর্ষ স্তর হতে নিম্ন স্তর পর্যন্ত একই সরলরেখার মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ব ধাপে ধাপে প্রবাহিতহবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং ব্যক্তিকে এমন ভাবে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে কেউই-এর বাইরে না থাকে।

৬. শ্রম বিভাজনের নীতি (Principle of division of labour) ঃ

সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো এর প্রকৃতি ও কাজের ধারণ অনুযায়ী কাজগুলোকে সঠিকভাবে চিন্তিত ও বিভাজন করা। এই বিভাজনের আলোকেই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগ খোলা হয় এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিরুপিত হয়। তাই কাজগুলোকে এমনবাবে বিভাজন করা উচিত যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ জ্ঞান প্রয়োগ ও অর্জনের সুযোগ পায়।

৭. তত্ত্বাবধান পরিসরের নীতি (Principle of span of supervision) ঃ

সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যবস্থাপকগণ সরাসরি কতজন অধস্তনের কাজ তত্ত্বাবধান করবেন তা সংগঠন কাঠামোতে নির্দিষ্ট করা হয়। এক্ষেত্রে একজন ব্যবস্থাপকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধঅনে কর্মরত কমীর সংখ্যা এমন কাম্য সংখ্যায় স্থির করা উচিত যাতে তার পক্ষে অধীনস্থের কাজ সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা যায়।

৮. ভারসাম্যের নীতি (Principle of balance) ঃ

সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর প্রতিটি বিভাগ, উপবিভাগ এবং ব্যক্তির কাজের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করা অত্যন্ত জরুরী। কেউ অধিক কর্মভারগ্রস্ত আর কারও কাজের চাপ নেই এমন যাতে না হয় সেদিকে সুদৃষ্টি রাখতে হবে। অপরদিকে ক্ষমতা ও কতৃত্বের কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরনের নীতির মধ্যেও ভারসাম্য বিধান করতে হবে।

৯. নেতৃত্বের নীতি (Principle of leadership) ঃ

সংগঠনকে এমনভাবে বিন্যাস করতেহবে যাতে এর বিভিন্ন স্তরের নির্বাহীরা কার্যকর নেতৃত্ব দানের সুযোগ পায়। সাধারণত পিরামিড আকৃতির সংগঠন কাঠামোতে ব্যবস্থাপকগণ পর্যায়ক্রমে নেতৃত্বদানের সুযোগ পান।

১০. আদেশের ঐক্যের নীতি (Principle of Unity of command) ঃ

এই নীতির মূল কথা হল একজন অধীনস্ত সরাসরি একজন বসের অধীনে কাজ করবে। কারণ একাধিক বস থাকলে দ্বৈত অধীনতার জন্ম দেয় এবং এক্ষেত্রে অধস্তন কোন বসের দায়িত্ব পালন করবে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। তাই দ্বৈত অধীনতা পরিহার করতে হবে।

১১. নমনীয়তার নীতি (Principle of flexibility) ঃ

ব্যবস্থাপনা সংগঠনে নমনীয়তা বজায় রাখা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন, উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতি পরিবর্তনশীল পরিসস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংগঠন গঠনের শুরুতেই থাকা উচিত।

১২. সরলতা ও স্পষ্টতার নীতি (Principle of Simplicity and clearity) ঃ

একটি সংগঠন তৈরীর সময় এর কাঠামো এমন ধরনের হওয়া উচিত যাতে তা সহজ ও সরল হয় এবং সকলের নিকট সহজে বোধগর্ম হয়। অর্থাৎ একটি সংগঠন এমনভাবে তৈরী করা উচিত যাতে প্রত্যেকটি কর্মী তার উর্ধ্বতন ও অধীনস্তদের সম্পর্কে এবং এদের প্রত্যেকের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

১৩. ব্যতিক্রমের নীতি (Principle of exception)

সংগঠনে কর্তব্য ও দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের নীতি অনুসরণ করা উচিত। এক্ষেত্রে রুটিন ওয়ার্ক অধস্তন কর্মীদের হাতে অর্পণ করা উচিত আর ব্যতিক্রমধর্মী জটিল বিষয়াদি শীর্ষ ব্যবস্থাপনা স্তরের জন্য রাখা উচিত।

পাঠ সংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ, ও কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে পন্থা বা হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে সংগঠন কাঠামো (structure) বলে।

সংগঠন কাঠামো কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে এবং এই নির্ধারিত সীমার মধ্যেই ব্যবস্থাপনাকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়।

কোন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোকে যখন একটি নকশা বা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে সংগঠন চার্ট বলে।

সাংগঠনিক কাঠামো ও সংগঠন চার্টের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো- কাঠামো চাক্ষুষ দেখা যায় না কিন্তু চার্ট চাক্ষুষ দেখা যায়।

সংগঠন তালিকাকে- সমান্তরাল, পিরামিডাকৃতির, উলম্ব ও বৃত্তাকার-এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (|) চিহ্ন দিন।

১. সংগঠনের মধ্যকার কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে-
ক. সংগঠন কাঠামো   খ. সংগঠন চার্ট
গ. কমিটি   ঘ. পর্ষদ

২. চিত্রের সাহায্যে কাঠামো প্রকাশ করাকে বলা হয়-
ক. সংগঠন কাঠামো   খ. সংগঠন চার্ট
গ. টাস্কফোর্স   ঘ. কমিশন

৩. সংগঠন তালিকাকে ভাগ করা যায়-
ক. ২ ভাগে   খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে   ঘ. ৫ ভাগে

৪. পিরাডিমকৃতির সংগঠনের প্রবক্তা-
ক. কুঞ্জ ও অইরিচ   খ. টেরি ফ্রাংকলিন
গ. ডানহ্যান   ঘ. টেলর

৫. জাপানের ডায়েট সাজানো হয়েছে কোন ভাবে?
ক. সবরৈখিক   খ. উলম্ব
গ. আনুভূমিক   ঘ. গোলাকৃতি

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যবস্থাপনায় সংগঠন বলতে কি বুঝেন? ব্যবস্থাপনায় সংগঠনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক সংগঠন কি কি ধরনের হতে পারে? সরল রৈখিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

৩. সরল রৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন এর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

৪. কার্যভিত্তিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

৫. কমিটি সংগঠনের সংজ্ঞা দিন। কমিটি সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন। কমিটি সংগঠনের প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

৬. সংগঠন কাঠামো বলতে কি বুঝেন? সংগঠন কাঠামোর প্রকারভেদগুলো আলোচনা করুন।

৭. সংগঠন কাঠামোর নীতিমালাগুলো বর্ণনা করুন।